ভগিনী নিবেদিতা প্রসঙ্গে

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা

ভারতের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার কর্মোদ্যোগ, তাঁর ধ্যানধারণা ভাবনাচিন্তা নিয়ে যখনই কোনও আলোচনা বা প্রসঙ্গ করা হয়, তখন অবধারিতভাবেই তাঁর ওপরে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথাই উঠে আসে। অর্থাৎ স্বামীজীর প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে নিবেদিতার সম্বন্ধে আলোচনা যেন হতেই পারে না—এমনটিই আমাদের মনে হয়। একথা অনেকাংশে ঠিক বা সত্য নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি মনে করে নিই ভগিনী নিবেদিতা সম্পূর্ণতই বিবেকানন্দের নির্মাণ, তাহলে বোধ হয় একটু আপত্তির কারণ থাকতে পারে। আপত্তি এই কারণে যে মার্গারেট নোবলের কি কোনও পূর্ব সঞ্চয় ছিল না চরিত্রে, মননে, যাকে ভিত্তি করেই পরবর্তী নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল? আগে এই প্রশ্নটির মীমাংসা না করে বোধহয় কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। সুতরাং ফিরে যেতে হবে তাঁর পূর্ব জীবনচর্যায়, খুঁটিয়ে জানতে হবে কোন অতীতের ওপর ভবিষ্যতের নির্মাণকার্য গড়ে উঠেছিল; সেটি কি তাঁরই একান্তভাবে নিজস্ব ছিল না? ছিল না কি নিজেরই ধ্যানধারণা দিয়ে গড়া?

মার্গারেটের পিতা ও পিতামহ উভয়েই ছিলেন আদর্শবান ধর্মযাজক। খ্রিস্টান চার্চ-প্রচলিত নীতি-নিয়ম মেনেই আদর্শ ধর্মবোধে জীবনযাপন করেছেন। পিতামহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন আয়ারল্যান্ডের মুক্তিসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং ধর্ম ও স্বদেশপ্রীতি এই দুয়ের সম্মিলিত বাতাবরণযুক্ত পরিবারেই মার্গারেটের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়েছিল।

কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে, একটু পরিণত মন-বুদ্ধি নিয়ে যখন তিনি চার্চে যাতায়াত করতে থাকেন, তখন চার্চের ধরাবাঁধা কিছু রীতিনীতি, গতানুগতিক অনুষ্ঠানভিত্তিক ধর্মচর্চা, পছন্দ অনুযায়ী ব্যক্তিবর্গকে সেবা ও সাহায্যদান—এসব তাঁকে কিছুটা হতাশ করে তোলে। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, ধর্ম মানে কি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকা, না কি ধর্ম বা ঈশ্বর সকলের জন্য সমান দরদি ও উদারদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন! তাঁর মননশীল, সেবাব্রতী মন তখনই তাঁকে চার্চের সংস্রব ত্যাগ করতে বাধ্য করে। তখন থেকেই, যেসব নিয়মাবলি মেনে চলাই খ্রিস্টান হওয়ার একমাত্র শর্ত ছিল, তার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ মার্গারেট গড়ে তুলেছিলেন নিজের মধ্যে।

এই প্রতিবাদী মনোভাবের কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, জন্মগতভাবেই তাঁর মধ্যে প্রকৃত সত্য, ধর্ম বা ঈশ্বরতত্ত্ব জানার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা ছিল। তাঁর

পিতা বা পিতামহ কেউই এমন মনোভাবের পরিচয় দেননি। এ ছিল তাঁর নিজস্ব সম্পদ। দেখতে পাই, নরেন্দ্রনাথ দত্তও—পরবর্তীতে যিনি মার্গারেটের গুরু স্বামী বিবেকানন্দ—যুবক অবস্থায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে আসার পূর্বে, প্রচলিত হিন্দুধর্মের জাতপাতের বিভেদকারী পুরোহিততন্ত্রের অনুষ্ঠানভিত্তিক সংকীর্ণ গণ্ডিকে অস্বীকার করে আপাত উদার নবসৃষ্ট ব্রাহ্মধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এমনই এক প্রতিবাদী মন নিয়ে।

মার্গারেট নোবল শিক্ষিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও নিজ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন দৃঢ়ভাবে। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি থেকে সরে এসে লন্ডনের উইম্বলডন শহরে নিজস্ব মৌলিকভাব অনুযায়ী শিশুদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন নিজ অর্থব্যয়ে ও দায়িত্বে, পেস্তালৎসি ও ফ্রয়েবেলের নব্য শিক্ষাবিজ্ঞান অনুসরণ করে। তৎকালে ওদেশে মার্গারেটের এই শিক্ষাদান খুবই জনসমর্থন লাভ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দকে চেনা-জানার পূর্বেই তাঁর মননশীলতা ও চিন্তার মৌলিকতা যথেষ্ট পরিস্ফুট এবং যাকে তিনি সত্য বলে বুঝেছেন তাকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকা, তাকে কার্যে পরিণত করার সুতীব্র ইচ্ছা—এসবই তাঁর জন্মগত বৈশিষ্ট্য।

আমরা জেনেছি নরেন্দ্রনাথ দত্তেরও অল্পবয়স থেকেই সত্যানুসন্ধিৎসা, সত্যপ্রিয়তা, জীবনে তাকে কার্যকরী করা—এসবই প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। মার্গারেট নোবলও এ-বিষয়ে কিছু কম ছিলেন না।

লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দের দুটি বা তিনটি ক্লাসে তিনি উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন। স্বামীজীর বেদান্তধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা, সমাজজীবন সম্বন্ধে নতুন ভাবধারা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মার্গারেটকে প্রশ্নমুখী করে তুলেছিল। বারংবার প্রশ্ন করে তিনি তাঁর সংশয় নিরসন করতে চেয়েছেন, অন্য শ্রোতারা যেখানে নীরবেই থেকেছেন। মার্গারেটের এতে মনে হয়েছে তিনি ক্লাসে অন্যদের বিরক্তি উৎপাদন করছেন এবং সেকথা স্বামীজীকে জানালে, তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে টানা ছ-টি বছর ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করে তবেই ওই পথের প্রতিটি ইঞ্চি জানতে পেরেছেন। সুতরাং মাভৈঃ। বুদ্ধিমতী মার্গারেটকে এই স্বীকারোক্তি একদিকে যেমন আশ্বস্ত করল, তেমনি অন্যদিকে আমরাও গুরুশিষ্যার এই চরিত্রগত সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত হলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোলোজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ যাঁরা পরবর্তী কালে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ধ্যানপরায়ণ, সপ্তর্ষির ঋষি নরেন্দ্রনাথকেই বেছেছিলেন জগৎকল্যাণকর্মের জন্য; এবং এই কারণেই, জগৎ সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মশক্তি, ক্রিয়াত্মিকা মা কালীকে নরেন্দ্রনাথের মেনে নেওয়াতে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা ও লন্ডনে অনেক বিদুষী মহিলার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সমাদর ও সেবা পেয়েছেন—এঁদের মধ্যে তিনি কিন্তু মার্গারেটকেই বেছে নিলেন, তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন ও তাঁকে ভারতকল্যাণকর্মে আহ্বান জানালেন এই বলে, ''জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে? হে মহাপ্রাণ, ওঠো জাগো।'' মার্গারেটও এই আহ্বানকে দৈবনির্দেশ-রূপে গ্রহণ করে ভারতের জন্য স্বামীজীর আরব্ধকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সহজাত ধর্মীয় ব্যাকুলতা, ধ্যানপরায়ণতাকে সরিয়ে রেখে শ্রীগুরুর নির্দেশিত কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, সে-অজানা পথের দুরূহতা হৃদয়ঙ্গম করেও। পরবর্তীতে তাঁর সংগ্রাম ও সাফল্য ইতিহাস নির্মাণ করেছে। অনুরূপভাবে মার্গারেটও তাঁর পরিচিত পরিবেশ, তাঁর অতিপ্রিয় শিক্ষাদান কর্ম, জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ও পড়াশোনার

বলয় থেকে বেরিয়ে অজানা দেশ ও তার কল্যাণকর্মে গুরুর আদেশেই ঝাঁপ দিয়েছেন, এবং তার পরের ঘটনাগুলি তো ইতিহাস।

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে মার্গারেট যে-তীব্র ঐকান্তিক স্বদেশপ্রেম প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার সঙ্গে পরাধীন স্বদেশ আয়ারল্যান্ডের জন্য নিজের মর্মবেদনা ও ক্ষোভের সম্পূর্ণ মিল দেখেছেন। তিনি 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে স্বামীজীর গভীর আন্তরিক স্বদেশপ্রীতির কাছেই তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন : "I had recognised the heroic fibre of the man (Swamiji), and desired to make myself the servant of his love for his own people. But it was his character to which I had thus done obeisance. As a religious teacher, I saw that although he had a system of thought to offer, nothing in that system would claim him for a moment, if he found that truth led elsewhere. And to that extent that this recognition implies, I became his disciple."

এই পরিচ্ছেদটিতে স্বামীজীর সঙ্গে মার্গারেটের চরিত্র ও ভাবনার সাদৃশ্যটি বেশ পরিষ্কারভাবেই ধরা দিয়েছে। গুরুর চরিত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য তিনি তুলে ধরেছেন—স্বদেশপ্রেম, খাঁটি অমলিন চরিত্র এবং সত্যনিষ্ঠা। এজন্যই যে মার্গারেট স্বামীজীকে আচার্যপদে বরণ করেছেন তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি রয়েছে এখানে। আমরা দেখেছি এর সবগুলিই মার্গারেটেরও চরিত্র-সম্পদ ছিল প্রথম থেকেই। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতেই পারে যে মার্গারেট ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও চরিত্র যেন সদৃশ ও সমান্তরালভাবেই অগ্রসর হয়েছে।

একথা সত্য যে সম মনোভূমিতে বাস না করলে একজনের মহিমা অন্যজনের গোচর হয় না। স্বামী সারদানন্দজী নিবেদিতার 'The Master as I Saw Him' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন, তাঁরা অর্থাৎ গুরুভ্রাতারা স্বামীজীর সঙ্গে বাস করে, খুব কাছ থেকে দিনরাত তাঁকে দেখেও, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও নিবেদিতার মতন এমন নিখুঁতভাবে তাঁকে জানতে বা বুঝতে সক্ষম হননি। তাই এ-গ্রন্থ রচনা নিবেদিতার জন্যই যেন নির্দিষ্ট ছিল। আমরা জানি যথার্থ জহুরিই যথাযথভাবে জহর চেনে, তাই উভয়কেই সমমর্যাদায় গ্রহণ করাই কর্তব্য।

গুরভাইদের স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, তাঁদের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন চিন্তা-ভাবনায় মৌলিক ছিলেন, তেমনি তাঁর শিষ্যসন্তানদেরও তাই হতে হবে। গতানুগতিক হওয়ায় কোনও কৃতিত্ব নেই। বলাবাহুল্য ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের যে-ঢেউ পাশ্চাত্য রেনেসাঁর আদলে এদেশে এসেছিল, তার প্রধান কথাই ছিল এই মৌলিক চিন্তাভাবনা—ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে, যা বিচার-বিতর্ককে নিছক বিশ্বাসের ওপরে স্থান দিয়েছিল। চিরাচরিত পথ ছেড়ে নব ভাবনায় উজ্জীবিত হওয়া, স্বাধীন সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া ইত্যাদি ছিল ওই নবজাগৃতির লক্ষণ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় এই নবজাগৃতির তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা লিখেছেন—এক, প্রচলিত ব্যাখ্যা ছেড়ে কোনও বিষয় সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ে নবজিজ্ঞাসা বা কৌতূহল; দুই, নিজ শক্তি ও স্বাধীন চিন্তার ওপর আস্থা এবং তিন; যুক্তিবিচার দ্বারা প্রচলিত বিশ্বাসের যাচাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনচর্যা, তাঁর বাণী ও কর্ম যুক্তি-বিচারসহ বিশ্লেষণ করলে দেখি যে তিনিই ছিলেন এই নবজাগরণের যথার্থ পথিকৃৎ। স্বামী বিবেকানন্দ এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করেই তাঁর গুরুর মৌলিকতার দিকটি উল্লেখ করেছেন। ধর্মের ক্ষেত্রে তৎকালে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈতবাদের মধ্যে মত ও পথ নিয়ে, সাকার-নিরাকার সাধনতত্ত্ব নিয়ে

যে-চিরাচরিত বিবাদ-বিদ্বেষ স্বীকৃত ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ তার জড় মেরে দিয়েছিলেন নিজ ধর্মজীবনে এই তিন মত ও পথের সাধনা করে ও তাতে সিদ্ধাবস্থা লাভ করে—তার সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে। মা কালীর উপাসনায় ও তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন-স্পর্শনে তিনি যে-দ্বৈত অবস্থায় স্থিত হন, সেই সাকার সাধনা থেকেই, 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই অদ্বৈত অনুভূতিতে তাঁর উত্তরণ। এজন্যই কেবলাদ্বৈতবাদী শংকরপন্থী তোতাপুরীর কাছে দৈবনির্দেশে তাঁর সন্ন্যাসগ্রহণ, একাদিক্রমে কয়েকদিন নিরাকার ব্রহ্মচৈতন্যে সমাধিমগ্ন হয়ে থাকা এবং পরবর্তীকালে এই সত্য উদ্‌ঘাটন যে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত—ধর্মপথে এ-তিনটি ক্রমিক পর্যায় বা স্তরমাত্র, মূলগত কোনও প্রভেদ নেই। যিনি কালীরূপে সগুণ সাকার তিনিই নির্গুণ নিরাকার। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। তাই যে-অদ্বৈতবাদ শংকরাচার্যের মতে শুধুমাত্র আরণ্যক জীবনে চর্চিত হতে পারত সংসার-বিমুক্ত সন্ন্যাসিসমাজ কর্তৃক, তাকে শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহপ্রাঙ্গণে, সংসারাশ্রমের আওতায় এনে সমাজ ও জাতির অশেষ কল্যাণসাধনে ব্রতী হন ও যুগান্তকারী ঘোষণা করেন : ''অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করো।'' এ থেকেই মানবসাধারণের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর যে-মৌলিক চিন্তাটি আমাদের চিন্তাজগতে আলোড়ন তুলেছে, সেটি হল : ''মাটির প্রতিমায় দেবতার পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষে হয় না?'' এ-ভাবটি গ্রহণ করেই স্বামীজীর ঘোষণা : ''অজ্ঞেরা যাকে মানুষ বলে, আমি তাকেই দেবতা বলি।''

সুতরাং দেখা গেল ধর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ও পথ নিয়ে, সাকার-নিরাকার উপাসনা নিয়ে যে-প্রথাগত বিবাদ-বিসংবাদ, সমাজের ক্ষেত্রে যাকে কেন্দ্র করে জাতপাতের বিভেদ মানবজীবনের মহিমা, অগ্রগতি ও স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল, রামকৃষ্ণদেব নিজ ধর্মসাধনার দ্বারা তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে তার শিকড়শুদ্ধ উপড়ে দিলেন। মনে রাখতে হবে যে এই প্রায়-অসম্ভব কাজটি তিনি করেছিলেন মা কালীকে ধরেই। মা কালী তাঁর কাছে, তাঁর চেতনায় ধরা দিয়েছেন জগৎসৃষ্টিকারী ক্রিয়াত্মিকা ব্রহ্মশক্তিরূপে। তাঁকে ধরতে গেলে তাঁর সৃষ্ট জগতের, সৃষ্ট জীবকুলের সেবা করতে হবে ভালবেসে ঈশ্বরজ্ঞানে, তবেই মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ সম্ভব হবে।

মার্গারেট নোবল তাঁর ধীশক্তি দিয়ে, মনন দিয়ে বুঝেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতনই তাঁর গুরু স্বামীজীরও জীবনের মূল চালিকাশক্তি কালীই। তিনিই এঁদের দিব্য কর্ম প্রেরণার উৎস। একথা অবশ্যই সত্য যে মার্গারেটের মধ্যেও এক দিব্য শক্তি ছিল। স্বামীজী তাঁকে ভবিষ্যৎ কার্যের ব্যাপারে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে—যে-শক্তি তাঁকে জগতের কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন, তিনিই মার্গারেটকেও ভারতকল্যাণে যুক্ত করেছেন, সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

নিবেদিতা তাঁর গুরুর মধ্যে যে-অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি দেখেছেন, তার পশ্চাতে এর উৎস যে-বিরাট অগ্নিগোলকটি রয়েছে, সেই রামকৃষ্ণদেবকেও তিনি পরোক্ষে দেখেছেন। আবার সেই অগ্নিগোলকটি যে-আধারে জন্ম নিয়েছিল, সেই পরমেশ্বরী মা কালীকেও তিনি মননে, ধ্যানে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজের পরিচয় লিখতেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা' বলে।

নিবেদিতা স্বামীজীর কাছে কালী উপাসনা, কালীমূর্তির ব্যাখ্যা, তার গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে শুনেছেন এবং তাকে যথেষ্ট মনবুদ্ধি নিবিষ্ট করে বুঝতে চেয়েছেন, যেমন প্রাথমিক পর্বে স্বামীজীর বেদান্ত আলোচনা ও তার মর্ম মেধা ও শ্রমশীলতা দিয়ে অবহিত হতে চেষ্টা করেছিলেন। এই ধর্মের ক্ষেত্রে—সাকার কালীপূজা ও নিরাকার অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান—এখানে এসেই যেন দেখছি নিবেদিতার

এ-যাবৎ চলা সদৃশ, সমান্তরাল জীবনচিত্রটি যেন পাল্টে গেল; ধর্মচেতনার এক নবপথে তাঁর পদসঞ্চার ঘটল। এখানেই তিনি আচার্যের সম্পূর্ণভাবে অনুসারী হয়ে তাঁর আদিষ্ট পথেই জীবনকে চালিয়ে দিলেন। এখানেই মার্গারেট সত্যসত্যই নিবেদিতায় রূপান্তরিত হলেন, সম্পূর্ণ হল তাঁর জীবনসাধনা, সত্য-অন্বেষণ।

এভাবেই নিবেদিতা কালীরূপের গভীরে ডুব দিলেন ও তাকে গ্রহণ করলেন, তার আপাত ভয়ংকর রূপের অন্তরালে যে-বরাভয়করা মাতৃমূর্তি তাকে মননে, ধ্যানে উপলব্ধি করে তার সম্বন্ধে লিখে, ভাষণ দিয়ে কলকাতার অভিজাত, শিক্ষিত বাঙালি জনমানসে আলোড়ন তুলে ফেললেন। একবার বিখ্যাত অ্যালবার্ট হলে, আর একবার কালীঘাটে মা কালীর নাটমন্দিরে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। যে-কালীর সমাদর করা দূরে থাকুক, তাঁকে পরিহার করতে উন্মুখ সভ্য শিক্ষিত ব্রাহ্মরা ও নব্য যুবসমাজ, তাঁর সপক্ষে একজন ইউরোপীয়ান মহিলা প্রচার করছেন, এ-দৃশ্য তৎকালীন কলকাতার সমাজে একেবারেই অকল্পনীয় ছিল। নিবেদিতার কালী-বক্তৃতা শুনে 'Indian Mirror' মন্তব্য করেছিল যে নিবেদিতার ভাষণ ''Very interesting and a new light imparting''। এ-কাজ অবশ্যই গোঁড়া হিন্দুদের কাছেও যেন এক নবজাগৃতি ছিল, ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টানদের কাছে তো বটেই। কারণ উভয়েই কালীরূপের বীভৎসতা ও তার পূজাপদ্ধতির চরম বিরোধী ছিল।

স্বামীজী তাঁর কবিতায় লিখেছেন, ''মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায়, নাম দেয় দয়াময়ী''...। দেবমূর্তিকে মিষ্টমধুর করে পূজা হল ভোগরাগ দিয়ে ফুলমালা চড়িয়ে—আমরা এতেই অভ্যস্ত ছিলাম। স্বামীজী বললেন, ভয়ংকরকে ভয়ংকররূপেই ভালবাসতে হবে, তা না হলে সত্য সাক্ষাৎকার হয় না। ভগিনী নিবেদিতা সেদিনের ভাষণের মধ্যে এই প্রশ্নই জাগিয়ে দিয়েছেন—''জীবনের প্রবল যন্ত্রণার মধ্যেই কি মহাসত্য ধরা দেয় না ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দরূপে?''—কালীরূপের মধ্যে এই দুই বিপরীত সত্য বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলেই নিবেদিতা উপলব্ধি করেছেন। বলাবাহুল্য এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শ্রীরামকৃষ্ণের সেই কঠোর কালীসাধনার পরিণামরূপেই যেন নিবেদিতার চেতনায় প্রতিভাত হয়েছে, এবং একইসঙ্গে নতুন করে ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টানদের কালীমূর্তির প্রতি তীব্র ঘৃণা-বিদ্বেষের প্রত্যাঘাতরূপে এসে যথার্থ বিচারের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে। মাতৃশক্তি একইসঙ্গে তো সৃজন-পালনকারী আবার সন্তানের ক্ষতিকর অশুভশক্তির বিনাশকারীও বটে। এই তো জগতে নিত্যসত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ 'Kali the Mother' নামে কবিতা লিখেছেন, নিবেদিতা আরও এক ধাপ এগিয়ে মা কালীকে নিয়ে দুবার মননঋদ্ধ দীর্ঘ ভাষণ দিলেন এই কালীক্ষেত্র কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে। এ-শক্তি যে তিনি লাভ করেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরূপ একীভূত যুগ্মশক্তির কৃপায়, একথা তাঁর অজানা ছিল না।

যে-ঐকান্তিক প্রীতি ও শ্রদ্ধায় নিবেদিতা ভারত ও ভারতীয় জাতিকে আপন দেশ ও জাতি বলে গ্রহণ করেছিলেন, তার জন্য তিনি স্বামীজীর কাছে অকুণ্ঠচিত্তে ঋণ স্বীকার করেছেন। স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি বলেছিলেন, তাঁর মতন আর কোনও বিদেশিনী কি স্বামী বিবেকানন্দের মতন এমন ভারত-ব্যাখ্যাতাকে পেয়েছিলেন?—এই প্রাপ্তিকে তিনি তাঁর পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেছেন।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারতধর্ম, সমাজ-বিশ্লেষণে নিবেদিতা গুরুর থেকেও যেন কিছুটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। যেমন ভারতের ক্ষেত্রে স্বামীজী 'regeneration' শব্দ

প্রয়োগে বাধা দেননি, বা নিজেও দু-একবার ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নিবেদিতা তৎকালে প্রচলিত পরাধীন ভারতবাসীর কণ্ঠে ভারতের মানোন্নয়নে 'regeneration of India' কথাটিতে বিশেষ আপত্তি তোলেন। তাঁর মতে শব্দটি কোনও না কোনও অভাববোধ বোঝায়, যেটাকে দূর করাই 'regeneration'; তা যদি হয়, তবে সব দেশেরই কোনও না কোনও অভাববোধ আছে, শুধু ভারতের নয়। তিনি মনে করতেন মানুষ হিসেবে একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজের সামর্থ্য ও যোগ্যতার কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এখানে যে একজন ইংরেজ তার জাতীয় জীবনকে, তার উদ্দেশ্যকে জেনে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে সচেষ্ট হয়। একজন ভারতীয় যদি তার জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হয়, তবে তাকে আর কেউ রুখতে পারবে না। তিনি লিখেছেন—"Let the Indian millions once arrive at a simple united idea of what they need and mean to have. Nothing in the world could resist them." ভারতের শুধু প্রয়োজন নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে সুসংহত করা। তাই 'regeneration' নয়, তার পরিবর্তে তিনি যে-শব্দটি ভারতের জন্য উপযুক্ত বোধে প্রয়োগ করেছেন, সেটি হল 'Self-organisation'। এটি অবশ্যই ভারতীয়দের চেতনা জাগরণে তখন বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল, সন্দেহ নেই।

আরও একটি কথা, যা আমরা স্বামীজীর মুখে ঠিক নিবেদিতার মতন করে শুনিনি, যা আমাদের কাছে একপ্রকার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বলেই মনে হয়েছে তা হল তাঁর 'aggressive Hinduism' শব্দটির প্রয়োগ। এখানে তিনি 'aggressive' কথাটি আক্রমণাত্মক অর্থে ব্যবহার করেননি, 'assert' করা অর্থেই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ হিন্দুদের যে-উদার ঔপনিষদিক ভাবধারা, বিভিন্ন পুরাণ পুঁথি অনুসরণে পূজা-অনুষ্ঠানের গভীর তাৎপর্য, নিবিড় সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন, এগুলিকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার ও তাকে সমর্থন করা, কোনও বিদেশি প্রভাবের কাছেই মাথা নত না করে—হীনম্মন্যতার শিকার না হয়ে জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলা, এটিই 'Aggressive Hinduism'। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষের ক্ষেত্রে ভগিনী নিবেদিতার অনন্য অবদান অনস্বীকার্য।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

● 'নিবোধত' সম্পাদনা বিভাগের পরিবর্তিত ই-মেল :
nibodhatapatrika@gmail.com

● কাগজ ও মুদ্রণের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়
পত্রিকার আজীবন গ্রাহকমূল্য (২৫ বছর) ৫০০০ টাকা এবং
বহির্ভারতে পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য (বিমান ডাক) ২০০০ টাকা হয়েছে।